একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার অধিকার আইন
প্রসঙ্গত ভারতীয় চিন্তাবিদ (রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও রোকেয়া)

- দেবার্ক মণ্ডল। বাংলা বিভাগ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, লেখকদের ভাবনায় নানা প্রসঙ্গে এসেছে শিক্ষা-ভাবনা বা শিক্ষা-দর্শন নিয়ে তাঁদের অভিমত। তাঁদের অভিমতের সাথে কথাও গিয়ে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার অধিকার আইনের একটা যোগসূত্র আমরা দেখতে পাই। যদিও বর্তমান শতাব্দীর এই শিক্ষা আইনটিকে তুল্যমূল্য বিচারে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনাগত বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে আইনটি হয়ত আগামী দিনে আরো যুগোপযোগী হয়ে উঠবে।

সূচক শব্দ : শিক্ষার অধিকার, সংশোধনী আইন, শিক্ষা আইনের ঘটনাক্রম, শিক্ষা-ভাবনা ও পরিকল্পনা, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রোকেয়া।

মূল আলোচনা :

জ্ঞানেতর অন্ধকার ছাড়িয়ে শিক্ষার আলোয় প্রতিটি মানুষের মন মানসিকতার বিকাশ সাধন অপরিহার্য। তথ্যটি খুবই আটপৌরে। অশিক্ষা যে কোন মানুষকেই তথা সমাজকে পঙ্গু করে এটা নতুন কোনো তথ্য নয়। কিন্তু এই তথ্যেরই পরিপূরক হিসেবে বর্তমান সময়েও আমাদের সমাজে স্কুল ছুট বা অশিক্ষিত শিশুদের নজির দুর্লভ নয়। তাই এই 'স্কুল ছুটদের' স্কুলে ফেরাতে বা শিশুদের অবাধে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে – "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯'। শিক্ষার এই অধিকার আইনের মাধ্যমে শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে যাতে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুরা বঞ্চিত না হয়।

- প্রথম শিক্ষার অধিকারের দাবি

১৮ই মার্চ ১৯১০ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ইম্পেরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে শিক্ষার অধিকার বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করে ভারতে "বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার" ব্যবস্থা করার দাবি করেন। এই প্রচেষ্টাকে আমরা অবশ্য নিম্নলিখিত ঘটনাক্রমের পরিণতি হিসেবে দেখতে পারি :

১৮৭০ : ব্রিটেনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন পাশ হয়।

১৮৮২ : ভারতীয় শিক্ষা কমিশন : ভারতীয় নেতারা শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের দাবি জানান।

১৮৯৩ : বরোদার মহারাজা আমরেলি তালুকে ছেলেদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে প্রসারিত করেন।

১৯০৬ : বরোদার মহারাজা রাজ্যের বাকি সব জায়গায় বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে প্রসারিত করেন।

১৯০৬ : বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ইম্পেরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে আবেদন জানান।

১৯১০ : গোখলে প্রাইভেট সদস্য বিল উত্থাপিত করেন (যা প্রত্যাখ্যাত হয়)

১৯১৭ : বিঠলভাই প্যাটেল বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর প্রথম আইন পাশ করাতে সক্ষম হন (এটা প্যাটেল আইন নামে পরিচিত)।

১৯১৮-৩০ : ব্রিটিশ ভারতের প্রতিটি প্রদেশে আইনের বইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩০ : উন্নত গুণমানের (পরিমাণের উপর জোর কম) জন্য হারটগ কমিটির সুপারিশ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকে ব্যাহত করে।

- এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর অবদান

১৯৩৭ সালে মহাত্মা গান্ধী সার্বজনীন শিক্ষার জন্য এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আহবান জানান। সার্বজনীন শিক্ষার জন্য তাঁর আবেদনের উত্তরে সরকার বলে যে, এই কাজের প্রয়োজনীর অর্থ সংগ্রহ করতে হলে মদ বিক্রির মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে। এর অর্থ হল এই যে, তাঁকে হয় মদ নিষিদ্ধকরণের দাবি ছাড়তে হবে, অথবা রাষ্ট্রীয় সহয়তায় সার্বজনীন শিক্ষার দাবি ছাড়তে হবে। তিনি লেখেন, ‘নতুন সংস্কারে নিষ্ঠুরতম তামাশা এটাই যে আমাদের শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য সরকারের হাতে মদের রাজস্ব ছাড়া আর কিছু নেই (হরিজন ৫, ২২২)’। শিক্ষার এই ধাঁধা তিনি সমাধান করেন জনগণের নিজস্ব অর্থে শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা পরে ‘নই তালিম’ নামে পরিচিত হয়।

- শিক্ষার অধিকার আইন প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট

উন্নিকৃষ্ণন ও অনান্যরা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে একটি ‘অধিকার’ হিসেবে গণ্য করে বলেন, ‘এ দেশের নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ২১ ধারা থেকে এই অধিকার জন্মায়। কিন্তু এটি চরম অধিকার নয়। এর অন্তর্বস্তু ও প্রয়োগ ৪৫ ও ৪১ ধারার দ্বারা নির্ধারিত। অন্য কথায়, এ দেশের প্রতিটি শিশু/নাগরিক ১৪ বছর বয়স অবধি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী। তারপর তাঁর শিক্ষার অধিকার রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতির দ্বারা সীমাবদ্ধ’।

- শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গে সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনী

উন্নিকৃষ্ণন মামলায় রায়ের পর এবং শিক্ষার অধিকারের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করার দেশব্যাপী দাবি ওঠার পর ১৯৯৩ সালের পর বিভিন্ন সরকার সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করার উদ্যোগ নেয়। ২০০২ এর ডিসেম্বরে ৮৬তম সংশোধনী গৃহীত হয় যাতে সংবিধানে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত নতুন ধারা যুক্ত হয় :

i) ২১(ক) ধারা অনুসারে রাষ্ট্র ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করবে যা রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্থির করবে।

ii) ৪৫ নং ধারায় জায়গায় নতুন ধারায় অন্তর্ভুক্তি – সংবিধানের ৪৫ নং ধারার বদলে নতুন ধারা যুক্ত হবে। রাষ্ট্র ৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

iii) ৫১(ক) ধারায় সংশোধনী : সংবিধানের ৫১(ক) ধারায় 'জে' উপধারার পর যুক্ত হয় ('কে' উপধারা) শিশুর বাবা-মা বা অভিভাবক ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেবে।

- ২০০৯এর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, তৈরি হওয়ার আগের ঘটনাক্রম

২০০২এর ডিসেম্বরে ৮৬তম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর ঘটনাক্রম :

২০০৩ : শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার বিল ২০০৩।
২০০৪ : শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার বিল ২০০৪।
২০০৫ : শিক্ষার অধিকার বিল ২০০৫(জুন) (CABE বিল)।
২০০৬ : শিক্ষার অধিকার বিল ২০০৫(আগস্ট)।
২০০৬ : কেন্দ্রীয় বিল বাতিল করে রাজ্যগুলোকে আদর্শ শিক্ষার অধিকার বিল ২০০৬ এর উপর ভিত্তি করে নিজস্ব বিল তৈরি করার পরামর্শ।
২০০৮/৯ : কেন্দ্রীয় বিলের পুনরুজীবন। বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য শিশুদের অধিকার বিল ২০০৮ রাজ্যসভা ও লোকসভায় পেশ ও গ্রহণ। আগস্ট ২০০৯ রাষ্ট্রপতির সম্মতি। অবশ্য, এই আইন এবং ৮৬তম সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ১লা এপ্রিল,২০১০।

- শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে নির্ধারিত শিশুর বয়সের সংজ্ঞা

সংবিধানের ২১(ক) ধারা অনুযায়ী এটা নির্ধারিত হয়। আইন যেহেতু সংসদ দ্বারা স্বীকৃত, তাই এটা বলা চলে সরকার এ ব্যাপারে সংসদের স্বীকৃতি নিয়েছে। সংবিধানের মূল ৪৫ ধারা উন্নিকৃষ্ণন মামলার রায় উভয়ই ৬বছর পর্যন্ত শিশুদেরও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিল। শিশু বিচার আইনে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু বলে ধরা হয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশনে(UNCRC)ভারত স্বাক্ষরকারী দেশ। তাতে শিশুর সংজ্ঞা ৭ম থেকে ১৮বছর বয়স পর্যন্ত । নীতিগতভাবে, শিশুবিচার আইন, জাতিসংঘ কনভেনশনে এবং সংবিধানের ২১নং ধারা (জীবনের অধিকার)কে শিক্ষার অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করে ০-১৮ বছর বয়সী সবাইকে শিশু বলে ধরা উচিত ছিল। কিন্তু, আর্থিক বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে আইন ২১(ক) ধারা ব্যাবহারে শিশুর সংজ্ঞা ৬-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে।

• অভিভাবকহীন শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইন

২১(ক)ধারায় শুধু শিশুর বাবা-মার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং ১০ধারায় শিশুকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বাবা-মার কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য ৮ধারা অনুসারে [ব্যাখ্যা (আই)] দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের, বাবা-মার নয়। কিন্তু যে শিশুর বাবা-মা নেই তার দায়িত্ব যথোপযুক্ত সরকারের।

• আলোচ্য আইনের মতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া

শিক্ষার অধিকার আইনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করা হয়েছে :

সব শিশুর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের একই রকম ক্ষমতা রয়েছে । কোনও শিশু যদি অন্যদের চেয়ে খারাপ করে, তাহলে সমস্যাটা শিশুর নয় বরং লালন পালনের ভিন্ন প্রক্রিয়া ও ভিন্ন যোগানের (input)কারণে এটা হয়েছে। সুতরাং শিশুটিকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্কুল ও ব্যবস্থার উপর বর্তায়। সেকারণে ফেল করানো, একই ক্লাসে আটকে রাখা বা বহিস্কার, ইত্যাদি শাস্তি একেবারেই অচল।

পরীক্ষায় ফেল করলে শিশু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সামাজিকভাবে নিন্দিত হয় এতে তার শিখবার ক্ষমতা বিকশিত হওয়ার বদলে আরও সঙ্কুচিত হয়। এরফলে অনেকে স্কুল ছেড়ে দেয়।

আইনে শিক্ষাদানের এমন এক পরিবেশ তৈরির কথা বলা হয়েছে যেন শিশু ভয়, উদ্বেগ ও আতঙ্কের মধ্যে না পড়ে। শুধু পাঠ্যবিষয় শেখার বদলে শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এমন হবে যাতে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তার সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশ হয়, সংবিধানের অবিকৃত মূল্যবোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও শিশু-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার মনোভাব গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে এবং বোর্ড-পরিচালিত পরীক্ষার বদলে লাগাতার মূল্যায়ণের পদ্ধতি নিতে হবে।

• শিক্ষা ভাবনা ও শিক্ষা পরিকল্পনাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯)এ শিশুদের জন্য আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে যদি আমরা বেশ কিছু শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিন্তার নিরিখে বিচার করি তাহলে আমরা হয়তো আলোচ্য আইনের সৃষ্টি ও নির্মাণ পর্বের পটভূমিকা অনুধাবন করতে পারব।

ক) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও দর্শন :

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবনদর্শন দ্বারাই প্রভাবিত। তাঁর এই শিক্ষাদর্শন এক দিকে যেমন ভাববাদী (idealist) চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে প্রয়োগের সময় দেখা যায় তিনি প্রকৃতিবাদী বা স্বভাববাদী (Naturalist) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তিনি যেমন বিশ্ব মানবাত্মার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেছেন, শিক্ষার সেই নীতির উপর ভিত্তি করে । তিনি বলেছেন – 'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য

পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।[১] রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব সংস্কৃতির অনুশীলন ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। আর পাঠক্রম রচনার জন্য সেই সব বিষয়কে গ্রহণ করার কথা বলেছেন, যাদের মধ্যে দিয়ে মানব সংস্কৃতির প্রতিফলন করা সম্ভব হবে এবং যার মধ্যে 'মনের প্রাণীন ধর্ম'[২] বর্তমান। এইজন্য তিনি তাঁর পাঠক্রমের ভিতর ভাষ্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পল্লীউন্নয়নমূলক কাজ এবং অনান্য সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি মাতৃভাষার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গতানুগতিক শিক্ষা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন 'ইংরেজী শিখতে গিয়ে না হইল শেখা না হইল লেখা; প্রকৃতির সত্য রাজ্যে প্রবেশ করিবারও অধিকার থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার রুদ্ধ রহিল'।[৩] রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক পরস্পর বিরোধী শিক্ষণ- পদ্ধতিরও কোন একটাকে মেনে নেননি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শিক্ষা-কৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম। তাকে একই নিয়মের বন্ধনে বেঁধে ফেলা যায় না। 'সুখ ও তাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখ ও তাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নইলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নইলেও তাহার রক্ষা নাই'।[৪] রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতি তিনটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ১) স্বাধীনতা (Freedom) ২) সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ (Creative self-expression) এবং ৩) প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ (Communication with nature and man)।

স্বাধীনতা বলতে রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাচারের অধিকারকে বোঝাননি। এর অর্থ হল ব্যক্তিত্বের সমস্ত শক্তি উন্মোচন করা এবং বন্ধনমুক্ত এই ব্যক্তিসত্ত্বার সাহায্যে বিশ্বের চিরন্তন শক্তিগুলোর সঙ্গে অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করা। তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে কাজ করার। তিনি স্বাধীনতাকে আত্মকর্তৃত্বের সমতূল্য হিসেবে বিচার করেছেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদের যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালনের কথা বলেছেন তেমনি দেহ মনের বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন – 'ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁত খুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে'।[৫]

এই স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ হল সৃষ্টি-কর্তৃত্ব। স্বাধীন ভাবে থেকেই সৃজন-প্রতিভার বিকাশ পাবে এবং তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে বিকশিত করবে। তাই তিনি তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে গান্ধীজির মত সৃজনাত্মক কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন – 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ' আর 'আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মনের সঙ্গে মিশিয়া যায়'[৬]। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশুর সক্রিয়তার সুযোগ রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে প্রজেক্ট বা বুনিয়াদী শিক্ষণ-পদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে। তিনি বাগান পরিচর্যার কাজ, লাইব্রেরী গোছানোর কাজ, নাটক-রচনা, অভিনয়, সঙ্গীত বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর পদ্ধতির মধ্যে। তিনি প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সংযোগ রেখে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। শিশুকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দিতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমে যাতে সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন হয়, তার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে যদি বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ না ঘটে, সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। মানুষের জন্ম বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানব-সমাজ এই দু'য়ের মধ্যে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই দুই উপাদানকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিখবার জন্য আলো, বাতাস,গাছপালা, মুক্ত আকাশ, চক, বোর্ড, পুঁথি ইত্যাদির মত আবশ্যকীয় । এই কারণে তিনি আশ্রমিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য আশ্রম বিদ্যালয়

স্থাপন করেছেন । তিনি অকপটে তাঁর বিশ্বাস্কে ব্যক্ত করেছেন – 'আমার আশা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে'।[৭]

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি মনে করতেন, শিক্ষক যদি আদর্শ গুণসম্পন্ন হন, তাহলে পদ্ধতির নতুনত্বের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন –'মানুষের কাছ থেকে শিখতে পারে, যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলিয়া ওঠে, প্রাণের দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হয়'।[৮] তাই রবীন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেননি বা কোন বিশেষ পদ্ধতিকে স্বীকার করেননি। তবে বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রয়োজনমত পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। আদর্শ শিক্ষক যে পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুমনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন, তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতি।

খ) <u>গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য :</u>

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মপলব্ধির পন্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্ত্বার পরিপূর্ণ প্রকাশকে বুঝিয়েছেন – 'All round drawing out of the best in child and man – body, mind and spirit'।[৯] তিনি বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য বস্তুতান্ত্রিক নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তার বিকাশসাধন করা। শিক্ষার এই আদর্শ আদর্শগত লক্ষ্যের কথা বললেও গান্ধীজী আধুনিক জগতের আপাত-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় জনগণের সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আরও কতকগুলো উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন। গান্ধীজি নাগরিকতার শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি মনে করতেন শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখানো যাবে। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এছাড়া তিনি মনে করতেন এই ধরণের শিক্ষা দেশবাসীর চরিত্রের দৃঢ়তা এনে দেবে। তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করবে। আত্মসংযমের মাধ্যমে চরিত্র দৃঢ়তর করতে না পারলে শিক্ষার কোন মূল্য থাকবে না।

গান্ধীজি তাঁর সমকালীন সময়ের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া দরকার। তাই পাঠক্রম-নির্বাচনের সময় এমন সব বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ-জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শিশুর সমাজ-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও উপস্থাপিত হবে । তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষাকে পাঠ্যবিষয় এবং পাঠদানের মাধ্যম – দুই হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব তাঁর সমাজতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। হস্তশিল্পের মাধ্যমে নগর জীবন এবং গ্রামীণ জীবনের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। শুধু তাই নয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। এর মাধ্যমে সহযোগীতামূলক মনোভাব, দায়িত্ববোধ, উৎসাহ ইত্যাদি জাগ্রত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হবে। গান্ধীজির এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার এক পাঠক্রম রচনা করেন। এই পাঠক্রম পরবর্তীকালে আরও পরিবর্তিত হয়েছে। তা হলেও এই পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি ছিল – ১) মূল হস্তশিল্পঃ সূতা কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ, কাগজের কাজ, কাঠের কাজ বা ধাতুর কাজ

। ২) মাতৃভাষাঃ পাঠ্যবিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চর্চা। ৩) গণিতঃ কেবলমাত্র ব্যবহারিক গণিত, বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প পরিচালনা করতে গেলে যতটুকু প্রয়োজন। ৪) সমাজ বিদ্যাঃ ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান পৃথক পৃথক ভাবে না শিখিয়ে সামগ্রিকভাবে সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ – অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য। ৫) সাধারণ বিজ্ঞানঃ বিজ্ঞানের সব শাখায় প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা। ৬) ছবি আঁকা। ৭) সঙ্গীত। ৮) বাধ্যতামূলক শরীর চর্চার ব্যবস্থা। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, এই ধরণের পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ-সাধন করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির গভীর সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে।

গান্ধীজি সমস্ত কিছু পাঠ্য বিষয় একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখানোর কথা বলেছেন। তাঁর পদ্ধতি একদিকে সক্রিয়তা তত্ত্বের (Principle of activity)উপর প্রতিষ্ঠিত । অন্যদিকে তাঁর পদ্ধতিতে তিনি অনুবদ্ধ প্রণালীকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। হস্তশিল্পের মাধ্যমে পাঠদান করলে, শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাকে বজায় রাখা যায়। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাব হয় না। তাই গান্ধীজির হস্তশিল্প ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিক মনোবিদ্যার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত, তিনি এই বিষয়ে ফ্রয়েবেল, মন্তেস্বরী, ডিউক প্রমুখ শিক্ষাবিদদের সঙ্গে একমত। অন্যদিকে তিনি বলেছেন, জ্ঞান মনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করে, সুতরাং মন একটি মূল জ্ঞানকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণও করবে। এর জন্য তিনি হস্তশিল্পকে (Basic craft) কেন্দ্র ক'রে অনান্য বিষয়ের জ্ঞান উপস্থাপন করতে বলেছেন। ফলে, এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, তিনি আধুনিক অনুবন্ধ প্রণালীকেও তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে স্থান দিয়েছেন। গান্ধীজি শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে ডিউক-এর শিক্ষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রোজেক্ট প্রদ্ধতির অনেক মিল আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে বিশেষ একটি প্রোজেক্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করা হয়, তেমনি গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাতেও একটি বিশেষ হস্তশিল্পের সাহায্যে অন্যান্য জ্ঞান সরবরাহ করা হয়।

গ) <u>রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য</u> :

বেগম রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মহিলাদের বিশেষত মুসলিম মহিলাদের উন্নতিসাধন। পিছিয়ে পড়া এসব মহিলারা সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন, প্রাত্যহিক রোজনামচায় যে সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক তা থেকে অনেকেই বঞ্চিত ছিলেন। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটতে থাকলেও প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা মহিলাদের মধ্যে তার প্রসার বাধাহীন ও স্বতস্ফুর্ত ছিল না। এসময়ে সমাজে গড়পড়তা পুরুষদের ধারণাই ছিল বেশি শিক্ষিতা নারী ঘরকন্না বা সংসারের পক্ষে অনুপযুক্ত। আসলে তারা বুঝতে পেরেছিল কোন শিক্ষিতা, সচেতন মনের উপর অনায়াসে নির্বিবাদে হুকুম চালিয়ে তাকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করানো যাবে না। কিন্তু শিক্ষিত পুরুষের পাশে শিক্ষিতা নারী যদি না থাকে তাহলে অর্ধাঙ্গী বিশেষণটি অচল হয়ে যায়। নারীটির শরীরী বলাভাল বস্তুগত মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্যই থাকে না। 'কারণ স্বামী যখন পৃথিবী থেকে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধুমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রান্নাঘরে যাতায়াত করেন, চাল ডাল ওজন করেন। তাই এরকম জোতির্বিদ পুরুষের পাশে যে নারীটি আছে তাকে কোনমতে সহধর্মিণী বলা যায় না'।[১০]

রোকেয়া দুঃখের সাথে জানাচ্ছেন - 'তেরো শত বৎসর আগেই পয়গাম্বর সাহেব আদেশ করেছেন শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে মুসলিমরা তাদের পয়গাম্বারের নামে প্রাণ দিতে চায় তারা কেন পয়গাম্বারের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ এই প্রশ্নের কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা আজও শিক্ষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিশেষত মুসলিম নারীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না'।[১১] এভাবে শিক্ষাগত অধিকার থেকে স্ত্রী জাতিকে যদি বঞ্চিত করে রাখা হয় তবে তাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হবে এটা কোন অভিনব তথ্য নয়। রোকেয়া তাঁর "বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি" প্রবন্ধে মিশর থেক আসা বিদুষী মহিলা যাকিয়া সুলেমান-এর উল্লেখ করেছেন। যিনি প্রকৃত অর্থেই একজন শিক্ষিতা রমণী। এলাহাবাদের এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বোঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন'।[১২] - এতে মাত্র তিন জন পুরুষ হাত তুলেছিলেন। পুরুষদেরই যখন এরূপ দূর্দশা তখন নারীদের কথা না বলাই ভাল। অনেকে বলেন মুসলিমদের ধর্মে বা ধর্মীয় গ্রন্থে কোন বিজ্ঞানের আলোচনা বিজ্ঞানের কোন প্রসঙ্গ নেই। আসলে কোরানের আরবি শব্দগুলো হয়তো অনেকেই পড়ে মুখস্থ করেন কিন্তু শব্দগুলির অর্থ যদি তাদের সহজবোধ্য হত তাহলে তারা বুঝতেন কোরানকে বিজ্ঞান বর্জিত বলাটা কতটা অজ্ঞানতার নিদর্শন। প্রসঙ্গত মনে আসে ইংরেজী শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না হল ভাষাটাকে শেখা না হল সাহিত্যটাকে জানা। এজন্য রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপরে জোর দিয়েছিলেন। অনুবাদ সাহিত্যের উপরেও তাঁর সমর্থন ছিল। তাই কোরানের অপরিচিত শব্দগুলি যদি আমাদের পরিচিত ভাষায় অনুদিত হয় তবে হয়তো এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হতে পারে।

তৎকালীন সময়ের তুলনায় আনুপাতিক হারে কম হলেও বর্তমান সময়ে এখনও প্রান্তিক সমাজের পর্দাপ্রথার অধীন, বরখার ব্যবহারে বাধ্য মুসলিম নারীরা 'রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা-মাসীকে অনবরত রোগ ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে'।[১৩] অসুখের মাত্রা বেড়ে গেলে তারা তখন হয়তো ডাক্তারের কাছে যায়। কিন্তু এই অসুখের উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদেরকে বাহ্যিক শারীরিক অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে মানসিক স্থিতিজাড্যের ব্যাধিকেই নির্মূল করতে হবে। রোকেয়ার মতে ব্যাধি সারানোর এই প্রক্রিয়ায় একমাত্র ঔষধ হল সু-শিক্ষা।

• আইনটির মূল্যায়ণ ও আলোচিত তিন শিক্ষা চিন্তকের প্রাসঙ্গিকতা :

শিক্ষার অধিকার আইনটিকে মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে এই আইনটিতে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার আগ্রহ , অনুরাগ মানসিক ক্ষমতা – এইসব কিছুর উপর নির্ভর করে শিশুর গুণ মান নির্ণয় করার কথা বলা হয়েছে । শিক্ষাকে শিশুর স্বতঃস্ফুর্ত চাহিদার সঙ্গে সমন্বিত করাই আলোচ্য আইনের উদ্দেশ্য । আধুনিক জীবনের প্রধান বিশিষ্ট্য হয় পরিবর্তনশীলতা। চিন্তাধারা, জীবন ধরণের কৌশল, সমস্ত কিছুরই দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পরিবেশে জীবনের গতিশীলতাকে গ্রহণ করার জন্য চাই শিক্ষিত, সচেতন চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মন ও মানসিকতা। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারি, তাহলে সুস্থ জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে বাস করতেন, বর্তমান গতিশীল জীবনের পথে যেমন স্বাভাবিক ভাবেই সেই জীবনাদর্শকে পরিবর্তিত হতে হয়েছে। তেমনি শিক্ষাও

জীবনের উপযোগী হয়ে সততই পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক সময়ে শিক্ষার ভাবধারা আমাদের জীবন পরিবেশের দ্বারা প্রত্যক্ষ্য ভাবে নির্ণীত হয়েছে। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জীবন-পরিবেশে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়াই আলোচ্য শিক্ষার অধিকার আইনটির লক্ষ্য। শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকারকে সে প্রসঙ্গে সুনিশ্চিত করার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার পূর্ববর্তী সময়ের পটভূমির দিকে খেয়াল করলে, আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের নানাবিধ চিন্তাধারার সঙ্গে যেন্ন বর্তমান শিক্ষা আইনের বেশ কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাই, তেমনি কিছু অসামঞ্জস্যও বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা ভাবনায় উল্লেখ করেছিলেন সঠিক ভাবে ইংরেজি না জেনে পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করার চেয়ে মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ বা মাতৃভাষায় বিভিন দেশের সাহিত্য অধ্যয়ন করার উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। আলোচ্য শিক্ষার অধিকার আইনেও বিষয়টি সমান গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুকে যথাসম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যেখানে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ভয় ও উদ্বেগহীন পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় শেখার বদলে শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধ্বের প্রস্তাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে শিশুর সক্রিয়তার বা সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনের কথা বলেছেন তাঁর এই পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট বা বুনিয়াদী শিক্ষণ পদ্ধতির যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। এসমস্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগের জন্য যে ধরণের "আশ্রম বিদ্যালয়" স্থাপন করার কথা বলেছেন, উপযুক্ত স্থানাভাব ও আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সর্বত্র সে ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

গান্ধীজির শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতির অনেক মিল আছে । প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে বিশেষ একটি প্রোজেক্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-সংগ্রহে সহায়তা করা হয়। তেমনি গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাতেও একটি হস্তশিল্পের সাহায্যে অন্যান্য জ্ঞান সরবরাহ করা হয়। আলোচ্য শিক্ষা আইনেও শিশুদের সৃজন ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সার্টিফিকেটে শিশুদের সৃজন স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয়ে তার দক্ষতার কথা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। গান্ধীজি দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করার জন্য ও শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে কর্মঠ করার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন সেখানে সমস্ত কিছু পাঠ্য বিষয় একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখানোর কথা বলা হয়। কিন্তু গান্ধীজির এই শিক্ষা পদ্ধতি যেন কোথাও গিয়ে অতিমাত্রায় হস্তশিল্প কেন্দ্রিক হয়ে যায়। তৎকালীন সময়ে হয়তো তা পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে হয়তো এই মাত্রাতিরিক্ত হস্তশিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির বাস্তবায়ন পুরোপুরি সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত বেগম রোকেয়ার শিক্ষা চিন্তায় উঠে এসেছে মূলত মুসলিম অনগ্রসর নারীদের প্রসঙ্গ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে শিক্ষার কথা বলেছেন, বর্তমান শিক্ষা আইনের প্রাথমিক ভিত্তিই হল শিক্ষার সমানাধিকার। রোকেয়া কোরান মুখস্থ করে শুধুমাত্র ধর্মীয় নিয়ম পালনের চেয়ে আরবি শব্দগুলোর সঠিক অর্থ অনুধাবন করার উপর জোর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গটি কোথাও গিয়ে শিক্ষার আইনের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বা অনুবাদ সাহিত্যের সঙ্গে পরিপূরক হয়ে যায়।

• <u>আলোচ্য আইনটির গ্রহণযোগ্যতা</u> :

“বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯”-এর একটি পর্যালোচনার পর কিছু ইতিবাচক প্রসঙ্গ যেমন আমাদেরকে আশান্বিত করে তেমনি কিছু নেতিবাচক প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করা অনুচিত হবে। শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন সার্বিকভাবে একটি প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ । তেমনি শিক্ষার অধিকার লাভ করবে প্রসঙ্গে বয়সের সীমাবদ্ধতা একটি স্পর্শকাতর বিষয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে শিশুর বয়সের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে ৬থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা হল ৬ বছরের নিচে যাদের বয়স তারা কেন বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার থেকে বাদ যাবে। আলোচ্য শিক্ষার অধিকার আইনের শিশুর সংজ্ঞায় যে সময়সীমা (৬ থেকে ১৪ বছর) উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক বা সর্বজনগ্রাহ্য এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। ৬ বছরের নীচে যাদের বয়স তারা শিশু নয় এমনটা বলা যেমন অযৌক্তিক তেমনি আলোচ্য শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুর বয়সের উর্দ্ধসীমা মাত্র ১৪ বছর। ১৪ বছর বয়সের পর কোন শিশুকে আমরা কি তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি ? এ প্রশ্নটির একটি সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর হল ‘না পারি না’। কারণ শারীরিক ও মানসিক কারণে আমরা ১৮ বছরের নীচের একটি শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে মেনে নিতে পারি না। যে কারণে ১৮ বছর বয়স্ক কোন নাগরিককেই ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তাই বর্তমানে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত যে আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে তাকে আগামী দিনে বেশ কিছু সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আশা করা যায় এই সংশোধন প্রক্রিয়া আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে আরও যথাযথ ভাবে শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে।

তথ্যসূত্র :

১) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১,পৃ.- ৬৫১
২) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫২
৩) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫২
৪) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫৩
৫) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫৩
৬) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫৩
৭) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫৪
৮) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা,

২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৫৪
৯) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১, পৃ.- ৬৬৪
১০) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত। ‘রোকেয়া রচনাসংগ্রহ’। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২৩ অগ্রহারণ ১৪০৮, পৃ.- ৩২
১১) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত। ‘রোকেয়া রচনাসংগ্রহ’। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২৩ অগ্রহারণ ১৪০৮, পৃ. - ৪১০
১২) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত। ‘রোকেয়া রচনাসংগ্রহ’। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২৩ অগ্রহারণ ১৪০৮, পৃ. - ৪১১
১৩) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত। ‘রোকেয়া রচনাসংগ্রহ’। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২৩ অগ্রহারণ ১৪০৮, পৃ. – ৪১৪

গ্রন্থপঞ্জি :

ক) <u>বাংলা বই</u>

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’। ষষ্ঠ খন্ড। চতুর্থ সংস্করণ। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১০
২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’। ষোড়োশ খন্ড। প্রথম সংস্করণ। বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৭
৩) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত। ‘রোকেয়া রচনাসংগ্রহ’। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২৩ অগ্রহারণ ১৪০৮
৪) সুশীল রায়। ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’। সপ্তম সংস্করণ। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২৬ শে জুন ১৯৬১
৫) প্রবোধ চন্দ্র সেন। ‘রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা’। চতুর্থ সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৭

খ) <u>ইংরেজি বই</u>

1) Jain M.k & Aggarwal J.C. ‘Encyclopedia of EDUCATION VOLUME 1’. Anshah publishing House, Kolkata, 2008
2) Sabyasachi Bhattacharya. ‘The MAHATMA And The Poet’. 4th reprint. National book Trust India, Kolkata, 2008

গ) পত্র-পত্রিকা

১) আনন্দ ঘোষ হাজরা (সম্পা.)। ‘পশ্চিমবঙ্গ’। গান্ধী সংখ্যা। বর্ষ ২৮। কলকাতা, জানুয়ারি **১৯৯৫**

লেখক পরিচিতি :

দেবার্ক মণ্ডল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে পিএইচ.ডি করেছেন। পছন্দের বিষয় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন। বর্তমানে ঠাকুরপুকুর ‘বিবেকানন্দ কলেজ’-এর অতিথি অধ্যাপক।